তারিখ ... 04 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সমকাল

কোচিং বন্ধে আইন, কার্যকারিতার শঙ্কা

শিক্ষা | ড. সুলতান মাহমুদ রানা

সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আমি যে বাসায় থাকি তার পাশেই একটি বাসায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক প্রতিদিন বিকেলে প্রতি ব্যাচে প্রায় ১৫ জন শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়ান। ওই কক্ষের অদূরেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় সম্মানিত অভিভাবকদের। খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি যে, কেউ কেউ প্রায় এক থেকে দেড় ঘণ্টা সময় ব্যয় করেও সংশ্লিষ্ট ওই শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়তে আসে। সারাদেশে যখন সাইনবোর্ড লাগিয়ে কোচিং বাণিজ্য রমরমা, তখন শিক্ষকের বাসায় আলাদা একটি কামরায় প্রাইভেট টিউশনি দেখে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সরকার যেখানে বারবার নির্দেশনা ও নীতিমালা জারি করে কোচিং বাণিজ্য নিয়ে নির্বাক হয়ে গেছে, সেখানে এমন ক্ষুদ্র পরিসরে প্রাইভেট টিউশনির ঘটনা নিয়ে অবাক হওয়ার অবকাশ নেই। এ বছরে নতুনভাবে আবার যখন শিক্ষা আইন ২০১৬ প্রণয়নের উদ্যোগ হাতে নিয়েছে সরকার, ঠিক তখনই এমন বিষয়ে পুনরায় চিন্তার সুযোগ হয়েছে। খসড়া শিক্ষা আইনে বর্ণিত বিধানাবলি নিয়ে অনেকটা আশার সঞ্চার হলেও বাস্তবে আদৌ শিক্ষা আইনটি আলোর মুখ দেখতে পারবে কি-না তা নিয়ে যথেষ্ট নিরাশ হওয়ার কারণ রয়েছে। বিশেষ করে বিগত কয়েক বছরেও এমন উদ্যোগ একাধিকবার গ্রহণ করেও সরকার শিক্ষা আইন সংসদে পাস করতে পারেনি। আবার অন্যদিকে শিক্ষা আইন পাস হবে কি-না এটি যেমন চিন্তার বিষয়, তার পাশাপাশি শিক্ষা আইন পাস হলেও আইনে উল্লিখিত ধারাগুলো যথাযথভাবে কার্যকর হবে কি-না তা নিয়ে দ্বিধা রয়েছে।

দীর্ঘদিন থেকে কেন প্রাইভেট টিউশনি ও কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে এবং কীভাবে করতে হবে তা নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা-সমালোচনা চলছে। কিন্তু এখনও তা বন্ধ হয়নি বরং অনেকক্ষেত্রেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কক্ষ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে কোচিং বাণিজ্যের লাইসেন্স পেয়েছে সংশ্লিষ্টরা। সারাদেশে যখন কোচিং বন্ধের তোড়জোড় শুরু হয়, তখনই ভাড়া বাসায় কোচিং বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করলে প্রকারান্তরে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কক্ষ ও সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে রমরমা কোচিং বাণিজ্য শুরু হয়েছিল, যা এখন আরও ব্যাপকতা পেয়েছে।

নানাবিধ নির্দেশনা ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও কোচিং বাণিজ্য বন্ধ না হওয়ার পেছনের প্রথম ও প্রধান কারণটি হলো, বিদ্যমান নীতিমালা ও নির্দেশনার দুর্বলতা কিংবা তা বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা। সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) জরিপ অনুযায়ী, একজন শিক্ষার্থী বছরে তার শিক্ষার পেছনে যে টাকা ব্যয় করে, তার মধ্যে ৩০ শতাংশ চলে যায় কোচিং আর হাউস টিউটরের ফি বাবদ।

রমরমা কোচিং বাণিজ্য বন্ধে ২০১২ সালের ২০ জুন কোচিং বাণিজ্য বন্ধের নীতিমালার প্রজ্ঞাপন জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। নীতিমালায় বলা হয়, সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা নিজ প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের কোচিং বা প্রাইভেট পড়াতে পারবেন না। তবে তারা নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-প্রধানের অনুমতিসাপেক্ষে অন্য স্কুল, কলেজ ও সমমানের প্রতিষ্ঠানে দিনে সর্বোচ্চ ১০ জন শিক্ষার্থীকে নিজ বাসায় পড়াতে পারবেন। কোনো কোচিং সেন্টারের নামে বাসা ভাড়া নিয়েও কোচিং বাণিজ্য পরিচালনা করা যাবে না। বাস্তবে এ ধরনের নির্দেশনাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এগুলো প্রকৃতপক্ষে অবাধে কোচিং বাণিজ্য করার জন্য শিক্ষকদের লাইসেন্স প্রদান ছাড়া কিছু নয়। কারণ প্রতিষ্ঠান-প্রধানের অনুমতিসাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক রমরমা কোচিং বাণিজ্যের সুযোগ পেয়ে যান। তাছাড়া আমার বাসার পাশে যে শিক্ষক নিয়মিত আলাদা আলাদা ব্যাচে যে প্রাইভেট টিউশনি করান, কখনও কি কোনো কর্তৃপক্ষ সরেজমিন খোঁজ নিয়ে দেখেছেন যে, সেখানে আসলে ওই শিক্ষকের বিদ্যালয়ের কোনো ছাত্রছাত্রী প্রাইভেট পড়ে কি-না। না যুক্তিসঙ্গতভাবেই তার বিদ্যালয়ের কেউ পড়তে এলে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেন। প্রকৃতপক্ষে এমন খোঁজ নেওয়া দূরে থাক, যারা এটি বন্ধ করার অধিকার কিংবা ক্ষমতা রাখেন, তারাই হয়তো অভিভাবকের কাতারে দাঁড়িয়ে থেকে বাইরে সময় কাটান।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়নের পর অনেকেই ভেবেছিলেন যে, শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি ঘটবে। স্বভাবিকভাবেই আমরা ভেবেছিলাম গাইড বই থাকবে না, কোচিং থাকবে না। শিক্ষায় যথাযথ সৃজনশীলতা আসবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই অনেকটা কোচিং কিংবা প্রাইভেটনির্ভর হয়ে উঠেছে। ভর্তি কোচিং থেকে শুরু করে নানাবিধ কোচিংয়ের সাইনবোর্ড রাস্তার ধারে ঝুলতে দেখি। অনেকক্ষেত্রে অভিযোগ শোনা যায়, কিছু শিক্ষক শ্রেণীকক্ষেও গাইড বই কেনার নির্দেশনা দিয়ে থাকেন শিক্ষার্থীদের। এমনকি কাউকে কাউকে প্রকাশকের কাছ থেকে কমিশন নিয়ে ক্লাসে গাইড বইয়ের বিজ্ঞাপন করার কথা শুনে থাকি।

ইতিমধ্যেই শিক্ষা আইন ২০১৬ প্রণয়নের লক্ষ্যে জনসাধারণের কাছে ই-মেইলে মতামত নেওয়া হয়েছে। ওই আইনের ৫৪(১) ধারায় বলা হয়েছে, 'সরকার প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।' এবং ৫৪ (৪) ধারায় বলা হয়েছে, ' বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।'

ধরে নিলাম, শিক্ষা আইন ২০১৬ পাস হলো। কিন্তু এই আইনের অধীনে কোন পর্যায়ের কোচিংগুলো আসবে কিংবা কোনটি আইনের আওতার বাইরে থাকবে কি-না তা নিয়ে স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। অন্যদিকে উল্লিখিত বিধান কিংবা ধারা সংবলিত আইনকে আমরা কোচিং বন্ধের অন্যতম পদক্ষেপ হিসেবে ধরে নিলেও তা বাস্তবায়নের শঙ্কা থেকে আমরা কেউই মুক্ত হচ্ছি না। কারণ বাংলাদেশের বিভিন্ন আইনে ভালো ভালো কিছু নির্দেশনা কিংবা কঠোর শাস্তির বিধান থাকলেও অনেক সময় তা কার্যকারিতা সংকটে পড়ে। বাংলাদেশে এ রকম বহু আইন আছে যেগুলোর কার্যকারিতা তো দূরের কথা, আইন লঙ্ঘনের ঘটনা নাকের ডগায় এসে ঘুরলেও তার প্রতিকার কিংবা প্রতিরোধ কোনোটি পাওয়া যায় না। আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করে থাকি, সময়ে-অসময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে নানাবিধ অনৈতিক কর্মকাণ্ড। সেগুলোর যথাযথ বিচার দেশের ফৌজদারি আইনে করা সম্ভব হলেও তা অনেকক্ষেত্রেই হয় না। আমাদের দেশে নানাবিধ কোচিং বাণিজ্য রয়েছে, যেগুলোর সঙ্গে সরাসরি সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষক, পুলিশ অফিসার, ডাক্তারসহ সমাজের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি জড়িত থাকেন। আর এসব মান্য ব্যক্তিদের উপেক্ষা করে শিক্ষা আইনে বর্ণিত কোচিং বাণিজ্য-বিরুদ্ধ বিধানগুলো কতটুকু কার্যকর করা সম্ভব হবে তা নিয়ে কিছুটা শঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

sultanmahmud.rana@gmail.com